Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	7
Issue	1
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
Published online	June 15, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.1
Pages	1-26
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা, ১৩৭০

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

॥ ব্রহ্মাণ্ড ॥

ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ ব্রহ্মার ডিম্ব। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি সমস্ত "ইথর" বা গগনমণ্ডল সম্বন্ধে তার গোলাকৃতি ও গতির জন্যই প্রযুক্ত হয়। এমন কি ঊর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগে বিভক্ত থাকার জন্য পৃথিবীকেও ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। ভারতীয়রা আকাশের সংখ্যা গণনা করার সময়ে তার সমষ্টিকে 'ব্রহ্মাণ্ড' বলে। তার কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্রচর্চায় ওদের তেমন অধ্যবসায় নাই এবং জ্যোতিষের সঠিক ধারণাও ওদের নাই। সেজন্য আকাশমণ্ডলকে স্থির নিশ্চল বলে ওরা বিশ্বাস করে, বিশেষ করে স্বর্গের সুখকে পার্থিব সুখের মত বর্ণনা করে আকাশকে ওরা দেবতাদের বাসস্থান বলে কল্পনা করে বলে, যাদেরকে ওরা গমনাগমন ও অবতরণের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করে।

ভারতীয় শ্রুতির রহস্যময় ভাষায় বলা হয়, 'আদিতে জল ছিল এবং তা পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপ্তিকে পূর্ণ করে রেখেছিল।' এটি নিশ্চয়ই পুরুষহোরাত্রের প্রথম প্রহরের ও গঠন-মিশ্রণের প্রারম্ভিক ব্যাপার। ওরা বলে: 'জলে তরঙ্গ ও ফেন হতে থাকলে তার থেকে একটি শ্বেতকায় বস্তুর আবির্ভাব হল; সে

বস্তু থেকে স্রষ্টা 'ব্রহ্মাণ্ড' সৃষ্টি করলেন।' ওদের কারও কারও মতে, সে অণ্ডটি ভেঙে ফেলে তার থেকে ব্রহ্ম নির্গত হলেন। অণ্ডের অর্ধেক ভাগ আকাশ ও অন্যভাগ পৃথিবী, আর দুইভাগের মধ্যেকার চূর্ণগুলি বৃষ্টিতে পরিণত হল। বৃষ্টি না বলে, ওরা যদি পর্বত বলত, তাহলে ব্যাপারটি আরও আপাতসম্ভব মনে হত। অন্য একদল বলে যে ঈশ্বর ব্রহ্মাকে বললেন: "আমি একটি অণ্ড সৃষ্টি করছি, তার মধ্যে তুমি বাস করবে বলে।" তিনি উপরোক্ত জলের ফেন থেকে সেই অণ্ড সৃষ্টি করলেন। কিন্তু মৃত্তিকা যখন জলকে শুষে নিল, অণ্ডটি তখন ভেঙে দুখণ্ড হয়ে গেল।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কারক Ascelpins সম্বন্ধে ইউনানীদের এই রকম ধারণা ছিল। Galenus যেমন বলেছেন, Ascelpins এর মূর্তি নির্মাণ করার সময় ওরা তার হাতে একটি ডিম্ব ধরিয়ে রাখে। তার দ্বারা ওরা ইঙ্গিত করে যে পৃথিবী গোল, ডিম্বটি পৃথিবীর আকার এবং সমস্ত পৃথিবীই চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োজন বোধ করে। ইউনানীদের বিশ্বাসে Ascelpinsএর যে স্থান, হিন্দুদের বিশ্বাসে ব্রহ্মের স্থান তার চেয়ে কিছুমাত্র হীন নয়, কারণ, ইউনানীরা বলে Ascelpins হচ্ছে ঐশী শক্তি। তার কর্ম থেকেই তার এরূপ নামকরণ হয়েছে, অর্থাৎ শুষ্কতা রোধ করা। কারণ শুষ্কতা ও শীত বৃদ্ধি হলেই মৃত্যু ঘটে। Ascelpins-এর প্রাকৃতিক উৎপত্তি সম্বন্ধে ওরা বলে যে, তিনি Appollo-র পুত্র; Planguares (فلا غورس) এর পুত্র এবং Kronos অর্থাৎ শনিগ্রহের পুত্র, এ ত্রিবিধ উৎপত্তি কল্পনা করে ওরা Ascelpinsএ ত্রিশক্তিসম্পন্ন দেবত্ব আরোপ করতে চায়।

হিন্দুরা সৃষ্টির আদিতে যে জলের অস্তিত্ব কল্পনা করে থাকে, তার কারণ জল দ্বারাই সমস্ত অণুপরমাণুর সংযুক্তি হয়, সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ঘটে এবং সমস্ত প্রাণীর জীবন টিকে থাকে। কাজেই, জল স্রষ্টার হাতে যন্ত্রবিশেষ, পদার্থ থেকে কিছু সৃষ্টি করার উপাদান। এইভাব কোরানেও আল্লাহ্‌র এই বাণীতে ব্যক্ত করা হয়েছে: "তাঁর 'আর্‌শ্‌ জলের উপর ছিল।" 'আর্‌শ্‌ শব্দে তুমি বাহ্যিকভাবে ঐ নামের কোন নির্দিষ্ট বস্তুই মনে কর, যাকে সম্মান করতে আদিষ্ট হয়েছ, কিম্বা আল্লাহ্‌র রাজ্য বা ঐরূপ কোন গূঢ়

ভাবই ধরে নাও, এখানে অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত জল আর আরশ্ ছাড়া আর কিছুই সেই সময় ছিল না। আমার এই পুস্তকটিকে যদি মাত্র একটি (হিন্দু) জাতির বিবরণে সীমাবদ্ধ না রাখতে হত, তাহলে আমি 'বাবেল' (Babylon) ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জাতিদের বিশ্বাস থেকে এই অণ্ডের ধারণার মত, কিম্বা তার চেয়েও বেশী মূঢ়তার পরিচায়ক ধারণার কথা উল্লেখ করতাম।

অণ্ডের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা ওরা যা বলে তার থেকে প্রমাণ হয় যে, যে এই ধারণার প্রবর্তন করেছে, সে অতি স্থূলবুদ্ধি লোক। ডিম্বের কুসুম (yolk) যেমন ব্রহ্মাণ্ডের খোসার অন্তর্ভুক্ত, পৃথিবীও যে তেমনই গগনমণ্ডল বা ইথরের অন্তর্ভুক্ত, সে কথা সে বুঝত না। সে মনে করেছে যে, পৃথিবী নীচে, আর আকাশ ছয় দিকের মধ্যে মাত্র একদিকে, অর্থাৎ উর্ধ্বের দিকে অবস্থিত। যদি সে প্রকৃত অবস্থা জানত, তাহলে দ্বিখণ্ডিত অণ্ডের কল্পনা করা তার প্রয়োজন হত না। তবে তার কথার উদ্দেশ্য ছিল যে, অণ্ডের অর্ধেক পৃথিবীরূপে বিস্তৃত ও অন্য অর্ধেক গম্বুজের ন্যায় তার উপর রক্ষিত আছে। এভাবে সমতল গোলকের ((plainsphere) বর্ণনায় সে যেন Ptolemyকেও ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয় নি। এই রকম উৎকট ধারণা সব যুগেই চলে আসছে; যার যেমন ধর্মবিশ্বাস, সেইভাবে সে তার ব্যাখ্যা করে। 'Timaes' গ্রন্থে Plato 'ব্রহ্মাণ্ডের' মতই কথা বলেছেন: "বিধাতা একটি সরল সুতাকে অর্ধেক করে দুভাগে কেটে নিলেন; প্রত্যেক অংশ দিয়ে তিনি একটি করে বৃত্ত রচনা করলেন এমনভাবে, যেন বৃত্ত দুইটি দুইটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে। একটি বৃত্তকে তিনি আবার সাত ভাগে ভাগ করলেন।" তাঁর অভ্যাসমত, Plato একথা বলে বিশ্বের বিষুববৃত্তিক (Equinoxial) ও আহ্নিক (diurnal) গতিদ্বয় ও গ্রহ গোলকের প্রতি সাঙ্কেতিক ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন।

'ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের' প্রথম অধ্যায়ে, যেখানে চন্দ্রকে প্রথম আকাশে ও শনি পর্যন্ত বাকী ছয়টি গ্রহের প্রত্যেকটিকে পরবর্তী এক একটি আকাশে রেখে তার সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "অষ্টম আকাশে স্থির নক্ষত্র আছে। চিরস্থির থাকার জন্য এই আকাশকে গোলাকার করা হয়েছে, যার মধ্যে শিষ্টকে পুরস্কার ও দুষ্টকে শাস্তি দেওয়া হয়, কারণ এ আকাশের

পিছনে আর কিছু নাই।" এই অধ্যায়ে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, গ্রহগুলিই আকাশ। তবে গ্রহগুলির যে ক্রমবিন্যাস তিনি দিয়েছেন, তা ওদের শ্রুতি ও শাস্ত্রে বর্ণিত বিন্যাসের বিপরীত। এ বর্ণনা আমি যথাস্থানে দেব। ব্রহ্মগুপ্ত অষ্টম আকাশের গোলাকৃতির উল্লেখ করে যেন আরও বলতে চান যে, তাকে শুধু বাইরে থেকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করা যেতে পারে। গোলাকৃতি ও ঘূর্ণন সম্বন্ধে Aristotleএর ধারণার সঙ্গে যেন তাঁর পরিচয় ছিল এবং গ্রহগুলির পিছনে কোন বস্তু নাই, একথা বলে তিনি যেন Aristotleএরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

ব্রহ্মাণ্ড যদি এইরূপই হয়, তাহলে স্পষ্টতঃ তাকে গ্রহের সমষ্টি বা "ইথর" বরঞ্চ বিশ্বজগৎই মনে করতে হয়। কারণ, হিন্দুদের মতে, কর্মফলপ্রাপ্তি পরজন্মে এই বিশ্বজগতের মধ্যেই হয়ে থাকে।

'পলিশ' তাঁর সিদ্ধান্তে বলেছেন: "বিশ্বজগৎ হচ্ছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের সমষ্টি। আকাশ অন্ধকারের পিছনে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখে আকাশ নীল দেখায়, কারণ তাতে সূর্যকিরণ পৌঁছায় না, সেজন্য তা গ্রহ ও চন্দ্রের জলীয় আলোকহীন গোলকগুলির মত আলোকিত হয় না। এগুলির উপর সূর্যকিরণ পড়লে এবং পৃথিবীর ছায়া তাকে আবৃত না করলে, তাদের অন্ধকার আবরণ দূর হয়ে রাত্রিতে তাদের আকার দৃশ্যমান হয়। আসলে আলোকের একটিমাত্র উৎস আছে। অন্য সবাই তার থেকেই আলো পায়।" এখানে পলিশ সর্বশেষ অধিগম্য সীমার কথা বলেছেন এবং তাকেই আকাশ নাম দিয়েছেন। এই আকাশকে তিনি অন্ধকারে স্থাপন করেছেন, যেহেতু তিনি বলেছেন যে সেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছায় না। আকাশের নীলাভ রঙের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ বলে এখানে তার অবতারণা করা গেল না।

উপরোক্ত অধ্যায়ে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "চন্দ্রের আবর্তন সংখ্যা—অর্থাৎ ৫৭৭,৫৩৩,০০০,০০ কে তার গোলকের যোজন সংখ্যা, অর্থাৎ ৩২৪০০০ দিয়ে গুণ কর; এর গুণফল অর্থাৎ ১৮,৭১২,০৬৯,২০০,০০০,০০০ হচ্ছে রাশিচক্রের মোট যোজন সংখ্যা।" দূরত্বের পরিমাপক হিসাবে যোজনের পরিমাণ দূরত্বের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্তের এই উক্তি আমি অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম মাত্র। কারণ এই পরিমাপ করার কোন যুক্তি তিনি দেখান নি।

তবে বশিষ্ঠ বলেন : "গ্রহ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত সংখ্যাগুলি তার বিস্তারের পরিমাণজ্ঞাপক। কারণ রাশিচক্র ব্রহ্মাণ্ডের সাথে যুক্ত।" কিন্তু টীকাকার বলভদ্র মন্তব্য করেছেন : "এই সংখ্যাগুলিকে আমি আকাশের পরিমাণজ্ঞাপক মনে করি না, কেননা তার প্রসারের সীমা নির্ধারণ আমাদের শক্তির বাইরে। তবে আকাশকে মানুষের দৃষ্টির শেষ সীমা বলে মনে করি ; তার উর্ধ্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তবে অন্যান্য গ্রহগুলি পরস্পরের তুলনায় ছোট বড় বল ভিন্নরূপে দৃশ্যমান হয়।" আর্যভট্টের মতাবলম্বীরা বলে : "যে পর্যন্ত সূর্য কিরণ পৌঁছায়, সেই পর্যন্ত জানতে পারাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ; যেখানে সে কিরণ পৌঁছায় না, সে স্থানের প্রসার যত বিপুলই হোক না কেন, তার প্রয়োজন আমাদের নাই, কেননা, সূর্যকিরণ যেখানে পৌঁছতে পারেনা, তা মানবেন্দ্রিয়েরও অগম্য, এবং যা ইন্দ্রিয়াতীত, তা জানা সম্ভব নয়।"

এঁদের উক্তির মর্মার্থ যা দাঁড়ায়, তা এই : বশিষ্ঠের মতে ব্রহ্মাণ্ড অষ্টম গ্রহ, কিম্বা তথাকথিত রাশিচক্রসমেত একটি গোলক, যার মধ্যে স্থির নক্ষত্রগুলি অবস্থিত, এবং ব্রহ্মাণ্ড ও রাশিচক্রের গোলক দুইটি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন। অষ্টম গ্রহের কল্পনা করতে অবশ্য আমরা বাধ্য কিন্তু তার উপরে একটি নবম গ্রহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়ার কি আবশ্যকতা, বোঝা যায় না। এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত আছে। কেউ পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম গতির জন্য একটি নবম গ্রহের অস্তিত্ব প্রয়োজন মনে করে, যার নিজেরও গতি সেই মুখে এবং তার অন্তর্গত অন্য সব কিছুকেও যে সেই মুখেই আবর্তিত করায়। ঐ একই আবর্তনের কারণে অন্যেরা আবার নবম গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু মনে করে যে তার নিজের কোন গতি নাই।

প্রথমোক্ত দলের বক্তব্য সুস্পষ্ট—তবে Aristotle দেখিয়েছেন যে, গতিশীল বস্তু মাত্রই তার বাইরের আর একটি বস্তু থেকে গতিক্ষমতা লাভ করে। কাজেই এই নবম গ্রহের জন্যও অন্য আর একটি চালকের অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। তাহলে কোন নবম গ্রহের মাধ্যম ব্যতিরেকে এই চালকই অষ্ট গ্রহকে চালনা করছে, এরূপ অনুমান করতে কি বাধা !

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন তারা Aristotleএর উপরোক্ত কথা শুনেছে, আর তারা জানে যে প্রথম চালক নিশ্চল থাকে। কারণ তারা

নবম গ্রহকে গতিহীন বলে বর্ণনা করে, যার থেকে পশ্চিমমুখী আবর্তনের (motion) উৎপত্তি হয়। কিন্তু Aristotle আরও প্রমাণ করেছেন যে, প্রথম চালক কোনও অবয়ব বা বস্তু (body) নয়। কিন্তু তাকে গোলাকৃতি, গ্রহরূপী পরিসরবিশিষ্ট ও নিশ্চলরূপে কল্পনা করলে, তার অবয়ব থাকতে হবে। কাজেই প্রমাণ হয় যে নবম গ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব।

এ প্রশ্নে Almagest গ্রন্থের ভূমিকায় Ptolemyর মন্তব্য এইরূপ: শুধু গতিকেই যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির প্রথম গতির আদি কারণ হচ্ছে এক অদৃশ্য দেবতা, যে নিজে স্থির ও নিশ্চল। এই আদি কারণের আলোচনাকেই আমরা ঐশ্বরিক বিষয় বলি।

জগতের সর্বোচ্চ স্তরে তার এই কর্মকে আমরা উপলব্ধি করি, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার কর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কর্মরূপে।

নবম গ্রহের কোন ইংগিত না করে, আদি চালক (prime mover) সম্বন্ধে Ptolemy এই উক্তি করেছেন। তবে Proclus-এর মত খণ্ডন-প্রসঙ্গে বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johannes Grammaticus) এই নবম গ্রহের উল্লেখ এই বলে করেছেন যে, Plato নক্ষত্রহীন এই নবম গ্রহের কথা জানতেন না। তাঁর মতে, উপরোদ্ধৃত উক্তি দ্বারা Ptolemy নবম গ্রহের অনস্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন।

আবার আরেক দলের মত যে, গতিশীল বস্তুসমূহের শেষ সীমায় একটি স্থির বস্তু অথবা অনন্ত শূন্যতা কিম্বা এমন কিছু আছে যা শূন্য ও পূর্ণের মাঝামাঝি। এসব অনুমানের সাথে অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের কোন যোগ নাই।

বলভদ্র, মনে হয়, তাদের সাথে একমত, যারা মনে করে যে আকাশ বা আকাশমণ্ডল একটি সুগঠিত নিরেট বস্তু, যা সমস্ত ভারি বস্তুকে সমানভাবে ধরে রাখে ও বহন করে এবং যা গ্রহাদির উপরে অবস্থিত। আমাদের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করে সন্দেহকে গ্রহণ করা যেমন কঠিন, বলভদ্রের পক্ষে চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছেড়ে শ্রুতিতে বিশ্বাস করা ঠিক তেমনই সহজ।

এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আর্যভট্টের অনুগামীদেরই আছে। মনে হয় এরা সত্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অধিকারী। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ব্রহ্মাণ্ড' তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুসমেত 'ইথরের' নামান্তর মাত্র।

॥ ভারতীয় জ্যোতিষমতে আকাশ ও পৃথিবীর আকার ॥

এই বিষয়ে হিন্দুদের যা ধারণা ও সিদ্ধান্ত তা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে, এ বিষয়ে এবং মানুষের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয়েও কোরানে যে বাণী আছে, তাতে এমন কিছু নাই যার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা না করলে শ্রোতার মনে তা নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণত হয় না। কোরানের পূর্বে প্রেরিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও একথা বলে চলে। প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে কোরানের বাক্যগুলির সঙ্গে অন্যান্য প্রেরিত গ্রন্থের হুবহু মিল আছে এবং তার নির্দেশাবলীতে কোনও অস্পষ্টতা নাই। তাছাড়া, কোরানে এমন কোনও ব্যাপার নাই যা নিয়ে মতবিরোধ চলে আসছে, কিম্বা যার মীমাংসার আশা নাই—যেমন ইতিহাসের কোনও কোনও অস্পষ্ট তথ্য বা তারিখ। গোড়া থেকেই ইসলামকে এমন সব চক্রান্তকারীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যারা কায়মনোবাক্যে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে, এবং যারা সরলবিশ্বাসী লোকের কাছে কোরানের বাণী বলে এমন সব কথা পড়ে শোনাত যার একবর্ণও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বা প্রেরিত নয়। অথচ লোকে তাদেরকে বিশ্বাস করত এবং এই শঠতা না বুঝে এবং প্রকৃত গ্রন্থকে (কোরান) ত্যাগ করে প্রবঞ্চকদের মুখ থেকে শোনা এই মিথ্যা বাণী তারা নকল করে নিত; কেননা ইতরজনের মন যে কোন তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এই কারণে তাতে অসঙ্গতির সৃষ্টি হোল।

তারপরে ইবনুল মুকাফ্‌ফা, আবদুল করীম বিন্ আবিল 'আওজা প্রমুখ যিন্দিক ও মানী মতাবলম্বী লোকদের হাতে ইসলাম আর একবার বিপদের সম্মুখীন হল। ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্থলে এরা দুর্বলমতি লোকের মনে এক ও আদি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে দ্বৈতবাদের দিকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। মানীর জীবনচরিত্রকে তারা এমন পল্লবিত করে উপস্থিত করল যে লোকে তার প্রতি আস্থাভাজন হয়ে পড়ল। এই লোকটি (মানী) তার মিথ্যা ধর্মশাস্ত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, দেখা যায়, বিশ্বজগতের রূপ সম্বন্ধেও সে বাক্যাড়ম্বর করেছে। তার এই মতবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচারিত হল। ইহুদিদের উপরোক্ত প্রবঞ্চনার সাথে এই মতবাদগুলি ইসলাম নামে পরিচিত হতে লাগল। অথচ তার সাথে আল্লাহ্‌র কোনও সংশ্রবই নাই। যে এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ করে কোরানসম্মত সত্য ধর্মে অবিচলিত থাকত

তাকে ওরা কাফের ও মুল্‌হিদ্‌ (ধর্মভ্রষ্ট) বলে শিরচ্ছেদের বিধান দিত এবং তাকে কোরানের বাণী শোনার অনুমতিও দিত না। তাদের এরূপ আচরণ ফেরাউনের এই উক্তির চেয়েও গর্হিত: "আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রভু। তোমাদের পক্ষে আমার চেয়ে অন্য কোনও ঈশ্বরের কথা আমি জানি না।" এ ধরণের গোঁড়ামি বৃদ্ধি পেলে আমরা অচিরেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হারাব। যে আল্লাহ্‌র সম্মান করে ও যার সত্যানুসন্ধিৎসা অক্ষুন্ন আছে, আল্লাহ্‌ তাকেই সত্য পথে স্থির রাখেন।

হিন্দুদের শাস্ত্র ও পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বিশ্বজগতের আকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ওদেরই জ্যোতিষীদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিপরীত। তবে এইসব গ্রন্থ অনুসরণ করে ওরা ওদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং তার দরুন জনসাধারণ জ্যোতিষ গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় ও ফলাফল-বিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই কারণে জনসাধারণ জ্যোতিষীদের প্রতি অনুরক্ত হয়, তাদের সততায় বিশ্বাস করে এবং তাদের সাক্ষাৎ পাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জ্যোতিষীরা সবাই স্বর্গের অধিকারী, কেউ নরকে পতিত হবে না। এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রতিদানে জ্যোতিষীরাও জনসাধারণের চলিত সংস্কার ও ধারণাকে সত্য বলে প্রচার করে, তাদের মত আচরণ করে এবং তাদের মনোমত অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করে, তা সে সত্যের যতই বিপরীত হোক না কেন। এই কারণেই জনসাধারণের সংস্কারের সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কালক্রমে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে, যার ফলে জ্যোতিষীদের সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি ও অস্বচ্ছতা এসেছে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা গবেষণা না করে শ্রুতিকেই প্রামাণিক নীতিসূত্র ধরে নিয়ে কেবল অপরের অনুসরণ করে যায়। এরাই সংখ্যায় বেশী।

এখন আমরা বিশ্বজগতের আকার সম্বন্ধে হিন্দুদের মতামত বর্ণনা করব। ওদের মতে, আকাশ ও বিশ্বজগৎ বৃত্তাকার এবং পৃথিবীর আকৃতি গোলকের ন্যায়। তার উত্তরার্ধ শুষ্ক, দক্ষিণার্ধ জলময়। আয়োনীদের বিশ্বাসমতে ও বর্তমানে পর্যবেক্ষণে নির্ণীত পৃথিবীর যা আয়তন, হিন্দুদের ধারণায় পৃথিবী তার চেয়েও বড়। এই আয়তন নির্ণয় করার সময় কিন্তু ওরা সমুদ্র ও দ্বীপসমূহ এবং সেগুলির

বিপুল যোজন সংখ্যার উল্লেখ পর্যন্ত করে না। যেসব বিষয়ে তাদের নিজ শাস্ত্রের কোন হানি হয় না, সেসব বিষয়ে জ্যোতিষীরা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করে। যেমন উত্তর মেরুর নীচে মেরু পর্বতের এবং দক্ষিণ মেরুর নীচে 'বাড়বামুখ' দ্বীপের অবস্থান ওরা মেনে নেয়। মেরু পর্বত বাস্তবিকই সেখানে আছে কিনা, সেকথা অবান্তর, কারণ জাঁতার ন্যায় আবর্তনের বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যই তার অবতারণা করা হয়ে থাকে। কারণ, ভূপৃষ্ঠের সমতলভাগের প্রত্যেক অংশের সুবিন্দু (zenith) হিসাবে আকাশের প্রত্যেক অংশের সমতা (correspondence) আছে। দক্ষিণ মেরুর 'বাড়বামুখ' দ্বীপের ধারণাও বিজ্ঞানের কোন ক্ষতি করে না, যদিও খুব সম্ভব যে পৃথিবীর দুই-চতুর্থাংশ অবিচ্ছিন্ন ভূভাগ এবং অন্য দুই-চতুর্থাংশ অবিচ্ছিন্ন জলময় মহাসাগর। ওরা পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করে এবং যেহেতু সমস্ত ভারিবস্তু তার দিকে আকৃষ্ট হয় সেজন্য আকাশকেও গোলকাকৃতি মনে করতে ওরা বাধ্য হয়েছে।

এখন আমরা এ সম্বন্ধে হিন্দু জ্যোতিষীদের উক্তির অনুবাদ করব। এই অনুবাদে যদি কোন শব্দে আমাদের প্রচলিত অর্থের বিপরীত ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে পাঠক যেন তার আসল শব্দার্থই গ্রহণ করেন। আমাদের মধ্যে প্রচলিত অর্থে সে শব্দ ব্যবহার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

'পলিশ' তার 'সিদ্ধান্তে' বলছেন: 'ইউনানী পৌলিশ এক স্থানে বলেছেন, পৃথিবী গোলাকৃতি; আবার আর এক স্থানে বলছেন, পৃথিবীর আকার আবরণের ন্যায় চ্যাপটা, সমতল। দুইটি উক্তিই সত্য। কারণ, পৃথিবীর বহির্ভাগ বা পৃষ্ঠ বৃত্তাকার, আর তার ব্যাস হচ্ছে সরল রেখা (straight line)। পৌলিশের অন্যান্য উক্তি থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি পৃথিবীর গোলকাকৃতিতে বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া, বরাহমিহির, আর্যভট্ট দেব, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্রের মতো পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে একমত। যদি পৃথিবী গোলকাকৃতি না হত, তাহলে বিভিন্ন স্থানের অক্ষরেখা তাকে বেষ্টন করে থাকত না, শীত ও গ্রীষ্মে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যে কোন পার্থক্য হত না, এবং গ্রহ নক্ষত্রের যে অবস্থান ও আবর্তন আমরা দেখি, তাও হত না। তবে পৃথিবীর অবস্থান কেন্দ্রানুগ; তার অর্ধেক মৃত্তিকা, অর্ধেক জল। মেরু পর্বত শুষ্ক (মৃত্তিকা) ভাগে অবস্থিত, দেবতাদের আবাস; তার উপরে উত্তর মেরু। জলমগ্ন অন্য অংশে, দক্ষিণ মেরুর নীচে 'বাড়বামুখ'; দ্বীপের ন্যায় শুষ্ক; তাতে 'দৈত্য' ও নাগ প্রভৃতি মেরুবাসী

দেবতাদের সমগোত্রীয়রা বাস করে; সেজন্য তাকে 'দৈত্যান্তর' বলা হয়। আর্দ্র ও শুষ্ক ভাগকে যে রেখা বিভক্ত করে আছে তাকে 'নিরক্ষ' বলা হয়, অর্থাৎ যার অক্ষ রেখা (latitude) নাই। এটি আসলে বিষুব রেখা। এই রেখার চারিকোণে চারটি বৃহৎ নগর আছে: পূর্বে 'যমকোট'; পশ্চিমে 'রোমক'; দক্ষিণে 'লঙ্কা'; আর উত্তরে 'সিদ্ধপুর'। পৃথিবী দুই মেরুতে বাঁধা আছে এবং মেরুদণ্ড (axis) তাকে ধরে রেখেছে। 'লঙ্কা' ও মেরুর রেখাতে সূর্য উদয় হলে যমকোটে দ্বিপ্রহর হয়, 'রোমে' মধ্যরাত্রি হয় এবং 'সিদ্ধপুরে' সন্ধ্যা হয়। আর্যভট্ট এই রকম কথাই বলেছেন।

'ভিল্লমাল'নিবাসী 'জিষ্ণু'পুত্র ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' বলেছেন, "পৃথিবীর আকার নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছে, বিশেষ করে যারা পুরাণ ও শ্রুতিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। কেউ বলে যে পৃথিবী দর্পণের ন্যায় বৃত্তাকার ও সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত: এ সমুদ্র আবার মৃত্তিকাবেষ্টিত; এইভাবে পর্যায়ক্রমে সমুদ্র ও ভূভাগ মালার ন্যায় পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে। প্রত্যেকটি সমুদ্র ও ভূভাগের পরিমাণ তার বেষ্টিত ভাগের দ্বিগুণ। সর্বশেষ ভূভাগ কেন্দ্রস্থিত ভূভাগের চৌষট্টিগুণ বড়। আর সর্বশেষ সমুদ্র কেন্দ্রস্থিত সমুদ্রেরও চৌষট্টিগুণ বড়। কিন্তু বিভিন্নস্থানে নক্ষত্রের উদয় অস্ত বিভিন্ন সময়ে হওয়াতে আকাশ ও পৃথিবীকে বর্তুলাকার না হয়ে উপায় নাই; যেমন যমকোটের লোক কোন একটি নক্ষত্রকে যখন পশ্চিম দিগন্তে উঠতে দেখে ঠিক সেই সময়ে রোমকের লোক সেই নক্ষত্রটিকে ঠিক পূর্বাকাশে উঠতে দেখে। তেমনই, মেরুর লোক যে নক্ষত্রকে লঙ্কা বা রাক্ষস দেশের সমান্তরাল রেখার দিগন্তে উঠতে দেখে, সেই একই নক্ষত্রকে 'লঙ্কা'র লোক ঠিক সেই সময়ে তার মাথার উপরে দেখতে পায়। তাছাড়া, আকাশ ও পৃথিবী বর্তুলাকার না মনে করলে জ্যোতিষের কোন গণনা শুদ্ধ হয় না। তাই বাধ্য হয়েই আমরা বলি যে, আকাশ বর্তুলাকার, কারণ গোলকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমরা তাতে দেখতে পাই এবং পৃথিবী গোলক না হলে তার এই বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণও অশুদ্ধ হত। অতএব দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে অন্য সব মতবাদই ভ্রান্ত।'

পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আর্যভট্ট বলেছেন যে, পৃথিবী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি পদার্থই

গোলাকার। তেমনই 'বশিষ্ঠ' ও 'লাট'ও বলেছেন যে, পঞ্চভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, সমস্তই গোলাকার। বরাহমিহির বলেছেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই পৃথিবীর বর্তুলাকার হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং তার অন্যবিধ আকৃতি হওয়া অপ্রমাণ করে।

আর্যভট্ট, পলিশ, বশিষ্ঠ ও লাট সবাই এ বিষয়ে একমত যে যমকোটে যখন দ্বিপ্রহর, রোমে তখন মধ্যরাত্রি, লঙ্কাতে প্রভাত, আর সিদ্ধপুরে রাত্রির আরম্ভ। পৃথিবী গোল না হলে তা সম্ভব হোত না। পৃথিবী বর্তুলাকার না হলে, তেমনই সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের কালানুক্রমও ব্যাখ্যা করা যায় না। লাট বলেছেন, ধরিত্রীর প্রত্যেক স্থান থেকে আকাশ-গোলকের অর্ধেকভাগ মাত্র দেখা যায়। যত উত্তরে আমাদের অক্ষরেখা হয়, দিগন্তের তত উপরে মেরুপর্বত ও কুমেরু দেখা দেয়; আর দিগন্তের যত নীচে সেগুলি নেমে যায়, আমাদের অক্ষরেখার তত দক্ষিণে থাকে। এবং অক্ষরেখা এই দুই দিকের যত নিকটবর্তী হবে, সুবিন্দু থেকে বিষুব রেখাও তত নীচে অবনমিত থাকবে। যে বিষুবরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে আছে, সে তার দিকের মেরুই দেখতে পাবে, তার বিপরীত মেরু সে দেখতে পাবে না।

আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের বর্তুলাকৃতি হওয়া সম্বন্ধে এই হচ্ছে ওদের উক্তি। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী যে দৃশ্যমান আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে সম্বন্ধেও ওদের উক্তি এইরূপ। এসব ধারণা অবশ্য Ptolemyর Alvagestএর প্রথম অধ্যায়ের ও ঐ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের অন্তর্গত পদার্থবিদ্যার (Physics) মৌলিক সূত্র। তবে আমরা সেগুলিকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করতে অভ্যস্ত, এরা সেরকম করে না।

তার কারণ যে মৃত্তিকা জলের চেয়ে ভারি এবং জল বাতাসের মত তরল। যতক্ষণ না ঈশ্বরেচ্ছায় অন্য আকৃতি পাচ্ছে, ততদিন পৃথিবী বাহ্যিকভাবে বর্তুলাকৃতি হতে একরকম বাধ্য। কাজেই পৃথিবীর উত্তর দিকে সরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনই জলেরও দক্ষিণে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, যার ফলে অর্ধেকটা শুষ্ক আর অর্ধেকটাতে জল দাঁড়ায়। কারণ তা হতে হলে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে পৃথিবীর শুষ্কার্ধ কলসের ন্যায় শূন্যগর্ভ। বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি তাতে পৃথিবীর শুষ্ক ভূমিভাগ উত্তরার্ধের দুই-চতুর্থাংশের

একটিতে থাকতে বাধ্য। সেই কারণে, আমরা অনুমান করি যে পার্শ্ববর্তী অন্য চতুর্থাংশটিও উত্তরার্ধেই হবে। 'বাড়বামুখ' দ্বীপের অস্তিত্ব আমরা অসম্ভব মনে করি না। তবে তার অস্তিত্ব যে আছেই একথাও বলতে পারি না। কেননা মেরু পর্বতের মতো এ দ্বীপ সম্বন্ধেও যা বলা হয় তার সবই প্রবাদ ও লোকশ্রুতি

পৃথিবীর যে চতুর্থাংশ আমাদের পরিচিত, তাতে বিষুবরেখা ভূমি ও জলভাগের সীমা নির্দেশ করে না। কারণ অনেকস্থানে ভূমিভাগ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিষুবরেখাকে অতিক্রম করে চলে গেছে, যেমন পশ্চিমে সুদানের সমতলভূমি যা সমুদ্রের দিকে এতদূর প্রসারিত যে 'চন্দ্র' পর্বতশ্রেণী পার হয়ে নীলনদের উৎস ছাড়িয়ে এমন সব অঞ্চলের দিকে চলে গেছে যার সঠিক পরিচয়ও আমরা জানি না। ভূমি হিসাবে সুদানের সে অঞ্চল যেমন মরুময় ও দুর্গম, সমুদ্র হিসেবে হাবসী দেশের 'সুফালার' পিছনে যে সমুদ্র আছে সেও তেমনি দূরতিক্রম্য ; সেদিকে যে জাহাজই গেছে, নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য সে আর ফিরে আসেনি। তেমনি সিন্ধুদেশের উপরে ভারতবর্ষেরও এক বিরাট অংশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে এবং মনে হয় যেন বিষুবরেখা অতিক্রম করে চলে গেছে। উপরোক্ত এই দুই দেশের (ভারতবর্ষ ও সুদান) মাঝামাঝি আরব ও ইয়ামন্ অবস্থিত। কিন্তু সে দেশগুলি সমুদ্রের এত ভিতরে প্রবেশ করেনি যাতে বিষুবরেখা অতিক্রম করতে হয়।

ভূমি যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে, সমুদ্রও তেমনই ভূমির নানা অংশে প্রবেশ করে তাকে খণ্ডিত করে জলা ও উপসাগরের সৃষ্টি করেছে। যেমন আরবের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে জিহ্বার মত সমুদ্রের একটি অংশ মধ্য সিরিয়া পর্যন্ত চলে গেছে। 'কুল্‌জুমে'র কাছে সে অংশটি সবচেয়ে সরু হয়ে গেছে বলে ঐ (কুলজুম) নামেই সে অংশটি পরিচিত। সমুদ্রের আর একটি বৃহৎ বাহু দক্ষিণে আছে—পারস্য সাগর বলে খ্যাত। চীন ও ভারতবর্ষের মাঝেও সমুদ্র উত্তরের দিকে এক বিরাট বাঁকের সৃষ্টি করেছে।

এসব উদাহরণ থেকে মনে হচ্ছে যে, এই দেশগুলির সমুদ্রোপকূল বিষুবরেখাকে অনুসরণ করে না, আবার তার থেকে সমান্তরাল দূরেও থাকে না। এই চারটি নগরের আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে।

সময়ের যে প্রভেদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা পৃথিবী বর্তুলাকার হওয়ার আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকার দরুন। সেই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের উল্লেখ যদি করা হয়ে থাকে—আর নাগরিক ব্যতিরেকে নগর হয় না—তাহলে ভারি বস্তুমাত্রেরই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে, তা দিয়েই তার ব্যাখ্যা করা উচিত। বিশ্বের সে কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী।

বায়ুপুরাণে যা আছে তা প্রায় এইরূপ: 'অমরাবতীর' মধ্যাহ্ন, 'বৈবস্বতের' প্রভাত, 'সুখে'র মধ্যরাত্রি, আর 'বিভা'র সূর্যাস্ত।

'মৎস্যপুরাণে' বলা হয়েছে যে মেরু পর্বতের পূর্বে আছে 'অমরাবতীপুরী', ইন্দ্ররাজ ও তাঁর স্ত্রীর বাসস্থান; দক্ষিণে আছে 'সংগমনপুর', তাতে সূর্যপুত্র যমের আবাস। সেখানে সে মানবকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করে। পশ্চিমে 'সুখপুর', বরুণ অর্থাৎ সলিলের আবাস। আর মেরুর উত্তরে আছে 'বিভাবনপুর', চন্দ্রের নিজস্ব আবাস। সূর্য ও চন্দ্র মেরুর চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। 'অমরাবতীপুরে' সূর্য যখন মধ্য গগনে, 'সংগমনপুরে' তখন দিবারম্ভ, 'সুখপুরে' মধ্যরাত্রি আর 'বিভাবনপুরে' তখন সায়ংকাল। 'সংগমনপুরে' সূর্য মধ্যদিবসে এলে 'সুখপুরে' তখন সে উদিত হয়; 'অমরাবতীপুরী'তে অস্ত যায় আর 'বিভাবনপুরে' মধ্যরাত্রিতে অবস্থান করে।

'মৎস্যপুরাণের' লেখক মেরুর চতুর্দিকে সূর্যের যে আবর্তনের কথা বলেছেন, তা মেরুর অধিবাসীদের চতুর্দিকে চক্রবৎ আবর্তন, যার দরুন পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু নাই; তাদের দৃষ্টিতে সূর্য একই নির্দিষ্ট স্থানে উদয় না হয়ে বিভিন্ন স্থানে উদয় হয়। তবে গ্রন্থকার একটি বিশেষ নগরের সুবিন্দুকে পূর্ব আর একটি বিশেষ নগরের সুবিন্দুকে পশ্চিম নাম দিয়েছেন। জ্যোতিষীরা যে চারিটি নগরের কথা বলেছে, উপরোক্ত নগরগুলি সম্ভবতঃ তারই অন্য নাম। কিন্তু মেরুপর্বত থেকে নগরগুলির দূরত্ব কত 'মৎস্যপুরাণ'কার তা বলেন নি।

তাছাড়া ভারতীয়দের যেসব ধারণা আমি এখানে নিবদ্ধ করেছি, তা সবই নির্ভুল ও প্রমাণসিদ্ধ। তবে, ওদের এক অভ্যাস যে, মেরুর কথা বলতে গেলেই সেই সঙ্গে মেরুপর্বতেরও উল্লেখ না করে ওরা পারে না।

নিম্নের প্রকৃতি বা পাতাল (سفل) সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস ভারতীয়দেরও তাই। অর্থাৎ পাতাল জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। তবে বিষয়টির

ব্যাখ্যা ওরা অতি সূক্ষ্মভাবে করে থাকে। আর প্রশ্নটিও এমন জটিল যে বড় বড় পণ্ডিত ছাড়া এতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন : "পণ্ডিতেরা বলেন যে ভূগোলক আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে স্থিত, তাতে দেবতাদের বাসভূমি মেরুপর্বত আছে এবং দেবতাদের শত্রু দৈত্য ও দানবদের বাসভূমি 'বাড়বামুখ' তার নীচে অবস্থিত। এই 'নীচে' শব্দটি কিন্তু তাঁরা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কারণ আসলে সবদিকেই পৃথিবীর একই বিস্তার, তার উপরকার সব প্রাণীই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভারযুক্ত সমস্ত বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই তার উপরে এসে পড়ে। কেননা তার স্বভাব সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ ও ধারণ করা, যেমন অগ্নির স্বভাব দহন করা, বাতাসের স্বভাব গতিশীল হওয়া। কোন বস্তু পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও নীচে নামতে পারে না। কারণ পৃথিবীই একমাত্র নিম্ন; বীজকে যে দিকেই নিক্ষেপ কর, পৃথিবীতেই ফিরে আসবে এবং তাকে ছাড়িয়ে উপরে কখনই উঠতে পারবে না।

বরাহমিহির বলছেন, "পর্বত, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, নগর, মানব ও দেবতা সব কিছুই ভূগোলকের চতুঃপার্শ্বে আছে ; 'যমকোট' আর রোমক যদি পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত হয়, তাহলে বলা চলে না যে একটি অন্যটির নীচে আছে, কারণ নীচে বলে কিছু নাই । যে স্থান সবদিক দিয়েই অন্য যে কোন স্থানের সমান, তা যে নীচেই আছে, তা কেমন করে বলা যাবে? কোন স্থানেরই নীচে পড়ে যাবার ক্ষমতা অন্য স্থানের চেয়ে বেশী নাই, বরং প্রত্যেকটি স্থান নিজের সম্বন্ধে নিজকে বলছে 'আমি উপরে, অন্যরা সব নীচে'। অথচ সবাই চতুর্দিক দিয়ে ভূগোলককে বেষ্টন করে রয়েছে, যেমন কদম্ব বৃক্ষের ফুল। ফুলগুলি বৃক্ষকে বেষ্টন করে রয়েছে ; প্রত্যেকটি ফুলের অবস্থান একই প্রকার, কারুর নীচের দিকে মুখ, কারুর উপরের দিকে মুখ, এমন নয়। ধরাপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুকেই পৃথিবী আকর্ষণ করে। কারণ সবদিক থেকে পৃথিবীই সর্বনিম্নে এবং আকাশে সবদিক থেকেই উপরে।"

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ বিষয়ে হিন্দুদের ধারণাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে স্মৃতি ও শাস্ত্রকারদেরকে ওরা আবার কিছুটা প্রবঞ্চনাও করে থাকে। যেমন টীকাকার বলভদ্র বলছেন : "মতামতের বাহুল্য ও প্রভেদ সত্ত্বেও, সবচেয়ে শুদ্ধমত এই যে, ভূমণ্ডল, মেরু ও রাশিচক্র সবই গোলাকার। আর 'আপ্ত পুরাণকার' অর্থাৎ পুরাণের বিশ্বাসী অনুসারীরা বলছে : 'ধরিত্রী'

কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায়, তার নিম্নভাগ গোল নয়। (বলভদ্র বলছেন) তারা ঠিকই বল্‌ছে, কারণ পৃথিবী জলের মধ্যে অবস্থিত আর জলের উপরিভাগে যা দেখা যায় তা কূর্মপৃষ্ঠের আকার ; এবং পৃথিবীকে যে মহাসমুদ্র বেষ্টন করে রয়েছে তাতে যাতায়াত অসম্ভব। আর গ্রহমণ্ডলীর গোলাকৃতি তো চোখেই দেখা যায়।"

পাঠক লক্ষ্য করবেন, বলভদ্র কেমন করে কূর্মপৃষ্ঠের সংগে পৃথিবীর সাদৃশ্য স্বীকার করে নিয়ে শাস্ত্রকারদের উক্তিকে সমর্থন করলেন, অথচ কূর্মের নীচের দিক সমতল বলে পৃথিবীর গোলকাকৃতি সম্বন্ধে তারা যে অজ্ঞতার পরিচয় দিল সে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি বললেন না। উপরন্তু, এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, যা এখানে নিতান্তই অবান্তর।

বলভদ্র আবার বলছেন ঃ "মানবদৃষ্টি পৃথিবী থেকে তার ৫০০০ যোজনব্যাপী গোলকের ৯৬তম ভাগ, অর্থাৎ ৫২ যোজনের, অধিক দূরে যেতে পারে না। সেজন্য মানুষ তার বর্তুলাকৃতি দেখতে পায় না। একারণেই এ সম্পর্কে এত মতানৈক্য।"

(উপরোক্ত) পুরাণবিশ্বাসী লোকেরা পৃথিবীর গোলাকার হওয়া অস্বীকার করে না, বরঞ্চ কূর্মপৃষ্ঠের তুলনা দিয়ে তা সপ্রমাণই করতে চায়। বলভদ্র কেবল তাদের এ স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করতে চান, কেননা, কূর্ম সম্পর্কে তাদের উক্তির তিনি অর্থ করেছেন, "জল দ্বারা বেষ্টিত থাকা"। আসলে জলের উপরে যা দৃশ্যমান হয় তা তো গোলাকারও হতে পারে, আবার জলের উপরে উপুড় করা পিপে বা বেলুনাকৃতি (Cylindrical) স্তম্ভের অংশবিশেষের মতো সমতলও দেখাতে পারে। তার ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য মানুষ পৃথিবীর বর্তুলাকার দেখতে পারে না, বলভদ্রের এ উক্তিটিও ঠিক নয়। কারণ উচ্চতম পর্বতের শিখরের সমান দীর্ঘ হয়েও মানুষ যদি একই স্থানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন স্থানের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে একত্রিত করে বিচার বিবেচনা না করে, তাহলে তার সে দৈর্ঘ্য কোন কাজেই আসবে না এবং সে পৃথিবীর আকৃতি ও সীমানা কখনই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

কিন্তু পুরাণানুসারী লোকদের বিশ্বাসের সাথে বলভদ্রের মানবদৃষ্টির সীমা-সংক্রান্ত এ মন্তব্যের কি সম্বন্ধ আছে? যদি উপমার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতেন যে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ অর্থাৎ নীচের দিকও উপরের পৃষ্ঠের মতো গোল? তারপর পৃথিবীর আকার নির্ণয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করতেন, তাহলেও হত।

তবে পৃথিবী থেকে কতদূর মানবচক্ষু দিয়ে দেখা যেতে পারে, বলভদ্র তার যে সীমা নির্দেশ করেছেন, একটি বৃত্ত এঁকে তা পরীক্ষা করা যাক।

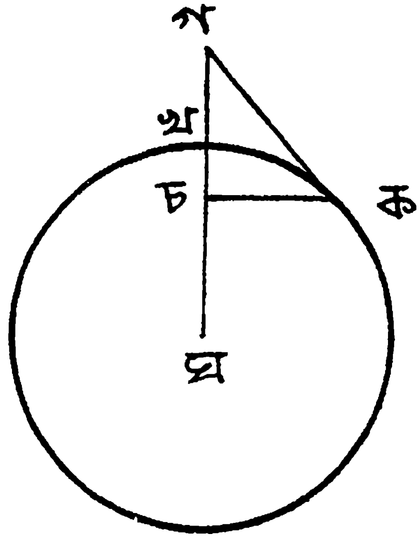

ভূমণ্ডলের কেন্দ্রকে 'ঘ' ধরে তার চতুর্দিকের বৃত্তের অংশ হোক 'কখ'; 'ঘ' দর্শকের দাঁড়াবার স্থান, আর তার উচ্চতা 'খগ'। 'গ' থেকে রেখা টানতে হবে যাতে রেখাটি পৃথিবীর বৃত্তের সাথে 'ক' বিন্দুতে এসে যুক্ত হয়। তাহলে দেখা যাবে যে, 'খক' হচ্ছে দৃশ্যমান অংশ (field of vision); সমগ্র বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করলে 'খক'-কে তার ১/৯৬ বা ৩৩/৪ ডিগ্রি মনে করতে হবে। মেরু পর্বতের আয়তন-নির্ণয়ে পূর্ব পরিচ্ছেদে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতি অনুযারী আমরা 'চক' এর চতুস্কোণকে 'চখ' দিয়ে, অর্থাৎ ৫০, ৬২৫ কে ৩৪৩১ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগ ফল হবে 'চগ' = ১৪ মিঃ ৪২ সেঃ; এবং দর্শকের উচ্চতা জ্ঞাপক 'খগ' হবে ৭ মিঃ ৪৫ সেঃ। অবশ্য এ হিসাবের মৌলিক অনুমান হচ্ছে, যে 'ঘখ' অর্থাৎ সমগ্র সাইন (Sine) এর পরিমাণ ৩৪৩৮ মিঃ, কিন্তু আমাদের উল্লেখিত বৃত্তের আয়তন-অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (Radius) হবে ৭৯২° ২৭′১৬″ যোজন। এই অনুপাতে যদি 'খগ' কে মাপি, তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে ১ যোজন ৬ ক্রোশ ও ১০৩২ গজ (=৫৭০৩৫ গজ), 'খগ' কে যদি ৪ গজের সমান মনে করি, তাহলে সাইন (Sine) এর মাপ মতে 'কচ' এর সঙ্গে তার যে আনুপাতিক সম্বন্ধ হবে তা ৫৭,০৩৬ গজের (উপরে নির্নীত দর্শকের উচ্চতা) সঙ্গে. সাইনের মাপ মত 'চক'-এর আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান, অর্থাৎ ২২৫। এখন, সাইনকে যদি মাপি, তাহলে ০°০″ ১″ ও ৩″ পাব; তার ব্যাসার্ধের মাপও তাই হবে। তবে ভূগোলকের প্রত্যেক ডিগ্রি ১৩ যোজন, ৭ ক্রোশ ৩৩৩১/৩ গজের সমান। কাজেই মানব দৃষ্টিতে ভূগোলকের দৃশ্যমান বৃত্তাংশের আয়তন হবে ২২১১/৩ গজ (!)।

বলভদ্রের যে গণনারীতি উল্লেখ করা গেল, তার সূত্র 'পৌলিশ সিদ্ধান্তে' আছে। পলিশ বৃত্তের এক চতুর্থাংশের চাপ (arc)কে ২৪ kardajat এ ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, "কেউ এর হেতু জানতে চাইলে তার বোঝা উচিত যে প্রত্যেকটি kardajat হচ্ছে সমগ্র বৃত্তের ১/৯৬ ভাগ, অর্থাৎ ২২৫ মিনিট।

তার সাইন পরিমাপ করলেও আমরা ২২৫ মিনিট পাব।" এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যেখানে চাপ (arc) এই kardajatএর চেয়েও ছোট, সেখানে তার Sine গুলি চাপের সমান। পলিশ ও আর্যভট্টের মতে, সমগ্র সাইন ৩৬০° ডিগ্রির বৃত্তের সংগে তার ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান। অংকের এই সাদৃশ্য দেখে বলভদ্র ভেবে নিয়েছেন যে, চাপ (arc) আসলে লম্বরেখা (perpendicular) এবং এমন কোন বিস্তার যাতে দৃষ্টি বাধা প্রাপ্ত হবার মত কিছু উঁচু হয়ে নাই, যার ফলে তার সবটাই দৃশ্যমান হবে।

একথা কিন্তু প্রকাণ্ড ভুল। চাপ (arc) কখনও লম্বরেখা নয়। এবং যত ছোটই হোক না কেন, সাইন কখনও চাপের সমান হয় না। গণনার সুবিধার জন্য যেসব ডিগ্রি কল্পনা করে নেওয়া হয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই এরূপ হতে পারে। কিন্তু ভূগোলকের ডিগ্রি গণনায় কোন কালেই এবং চীন পর্যন্ত কোন দেশেই তা সত্য বলে মনে করা হয় না।

পলিশ বলেছেন যে, পৃথিবীকে তার মেরুদণ্ড ধারণ করে রেখেছে। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি বলতে চান মেরুদণ্ড না থাকলে পৃথিবী পড়ে যাবে। সে কথা কেমন করেই বা তিনি বলবেন? তাঁর মতে তো পৃথিবীর চারিদিকে চারিটি বসতিপূর্ণ নগর আছে। তাঁর এ উক্তির কারণ যে, প্রত্যেক ভারযুক্ত বস্তু সব দিক থেকে পৃথিবীতেই এসে পড়ে। পলিশের আসল বক্তব্য হচ্ছে যে, বৃত্তের পরিসীমার (periphery) গতি (motion) তার কেন্দ্রস্থিত অংশ স্থির থাকার কারণে হয়, এবং দুইটি মেরু ও তাদের সংযোগকারী রেখা না থাকলে কোন গোলক চক্রাকারে ঘুরতে পারে না। এই ভাবনা বা তত্ত্বকেই মেরু বা অক্ষদণ্ড মনে করা হয়। পলিশের বলার উদ্দেশ্য যে আকাশের গতিই পৃথিবীকে তার স্বস্থানে এমন স্বাভাবিকভাবে ধরে রেখেছে, যেন তার বাইরে পৃথিবীর অবস্থান সম্ভব নয়। এই অবস্থান হচ্ছে আবর্তনের কেন্দ্র। ভূগোলকের অন্য ব্যাসগুলিকেও অক্ষদণ্ড মনে করা সম্ভব, কারণ সেগুলি নিজ ক্ষমতাতেই অক্ষদণ্ড। আর পৃথিবীর যদি আবর্তনের কেন্দ্র না থাকে, তাহলে সে আবর্তনের অক্ষদণ্ড তার বাইরে থাকতে হবে। সেজন্য অনুমান করা হয় যে অক্ষদণ্ড পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।

পৃথিবীর নিশ্চল থাকার প্রশ্ন পদার্থবিদ্যার এক প্রাথমিক সমস্যা, আর তার চূড়ান্ত সমাধান একরূপ দুঃসাধ্য। কিন্তু পৃথিবীর নিশ্চলতায় হিন্দুদের বিশ্বাস আছে। 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "অনেকের মত যে, পূর্ব থেকে

পশ্চিমমুখী যে মৌলিক প্রাথমিক গতি (الحركة الاولى), তা মধ্যরেখা (meridian)র গতি নয়, তা আসলে পৃথিবীর গতি।" বরাহমিহির তাদের মত খণ্ডন করে বলেছেন, "তাই যদি হোত, তাহলে পাখী একবার উড়ে পশ্চিমের দিকে গেলে, আবার তার বাসায় ফিরে আসতে পারত না।" বাস্তবিক পক্ষে বরাহমিহির যা বলেছেন তাইই ঠিক।

এই পুস্তকেরই অন্যত্র ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন: "আর্যভট্টের অনুগামীরা বলেন যে, পৃথিবী গতিশীল আকাশে নিশ্চল। এ ধারণার জবাবে বলা হয়েছে যে, তাহলে পৃথিবী প্রস্তর ও বৃক্ষাদি পড়ে যেত।" ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু এই জবাবের যাথার্থ্য মানতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে, পাথর ও গাছপালা যে গতির দরুন পড়ে যাবেই, এমন নয়। তাঁর একথা বলার যুক্তি যেন এই যে, সমস্ত ভারী বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন: "বরঞ্চ তাহলে আকাশের মিনিট (মুহূর্ত) গুলি (পৃথিবীর) সময়ের "প্রাণকে" সমান তালে চালিয়ে নিয়ে যেত না।"

(ব্রহ্মসিদ্ধান্তের) এই অধ্যায়ে মনে হয় কিছু গণ্ডগোল আছে, অনুবাদকের দোষেই হয়তো বা। কেননা আকাশের মিনিট হচ্ছে ২১,৬০০। এই মিনিটকে 'প্রাণ' অর্থাৎ নিঃশ্বাস বলা হয় এইজন্য যে, তাদের বিশ্বাসমতে, মধ্যরেখার (meridian) প্রতি মিনিটের (মুহূর্ত) দৈর্ঘ্য মানুষের এক নিঃশ্বাসের সমান। তাই যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং আকাশ পশ্চিম থেকে পূর্বের আবর্তন যতগুলি নিঃশ্বাসে সম্পন্ন করে, ব্রহ্মগুপ্তের মতানুসারে পৃথিবীও যদি ততগুলি নিঃশ্বাসেই তার আবর্তন সম্পূর্ণ করে, তাহলে আকাশের সংগে গতির সমতা রক্ষা করে যেতে পৃথিবীর কি বাধা থাকতে পারে? তাছাড়া পৃথিবীর আবর্তনের দরুন পদার্থবিদ্যার কিছুমাত্র হানি হয় না, কারণ এ বিদ্যাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলি আবর্তনবাদ দ্বারা যেমন ব্যাখ্যা সম্ভব, তেমনই অন্য সূত্রানুযায়ীও ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আরও অন্যান্য দিক আছে যা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীর আবর্তন সম্ভব নয়। সেজন্য এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীত ও বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক চিন্তা ও আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবীর আবর্তনের যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। 'মিফতাহ ইলমুল হাইয়াৎ' (পদার্থবিদ্যা-কুঞ্জিকা) নামে এই বিষয়ে আমি যে পুস্তক রচনা করেছি, তাতে, আমার বিশ্বাস, বাচনভংগীতে না হোক, অন্ততঃ যুক্তি ও সারমর্মে উপরোক্ত পণ্ডিতদেরকে আমি ছাড়িয়ে গেছি।

॥ পুরাণ ও জ্যোতিষীদের মতানুসারে বিশ্বপ্রকৃতির মৌলিক গতিদ্বয় ॥

এ বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষীদের মত প্রায় আমাদেরই মতো। ওদের উক্তি এখন আমি উদ্ধৃত করব; যদিও যা উদ্ধৃত করতে পারব, তা অতি সামান্য। পলিশ বলেছেন: "স্থির (fixed) নক্ষত্রমণ্ডলকে বাতাস আবর্তিত করে আর মেরুদ্বয় তাকে স্বস্থানে ধরে রাখে; মেরুপর্বতের অধিবাসীদের কাছে এ নক্ষত্রমণ্ডলীর গতি বাম থেকে দক্ষিণের দিকে মনে হয় এবং 'বাড়বামুখে'র অধিবাসীরা তাকে দক্ষিণ থেকে বামে যেতে দেখে।" অন্যত্রও তিনি বলেছেন: "যেসব নক্ষত্রকে আমরা পূর্বে উদয় হয়ে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমের দিকে সরে যেতে দেখি, তাদের অভিমুখীনতার (direction) কথা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তার জানা উচিত, যে গতিকে আমরা পশ্চিমমুখী দেখি, দর্শকের অবস্থানভেদে সেই গতিই আবার অন্যমুখী দেখাবে। মেরু পর্বতের অধিবাসীরা যে গতিকে বাম থেকে দক্ষিণের দিকে দেখবে, বাড়বামুখের লোকেরা তাকে বিপরীতমুখে দেখবে, এবং বিষুবরেখা থেকে সে গতি কেবলমাত্র পশ্চিমাভিমুখী দেখবে। আর বিষুবরেখা ও দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোকেরা সে গতিকে দক্ষিণ বা উত্তরে তাদের অক্ষরেখার (latitude) অবস্থানানুযায়ী, নিম্নমুখী দেখবে। এই সমুদয় গতি বায়ুসৃষ্ট, যা নক্ষত্রকে আবর্তিত করে, এবং নক্ষত্রদেরকে আপাতদৃষ্টিতে পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যেতে বাধ্য করে।" আসলে কিন্তু জ্যোতির্মণ্ডলীর গতি পূর্বাভিমুখী, অশ্বিনী নক্ষত্রের পূর্বদিকে অবস্থিত ভরণী নক্ষত্রের দিকে। আর প্রশ্নকারীর যদি চন্দ্র-ক্ষেত্রসমূহের জ্ঞান না থাকে এবং সে তার সাহায্যে এই পূর্বাভিমুখী গতির সম্যক ধারণা না করতে পারে, তাহলে চন্দ্রকেই তার লক্ষ্য করা উচিত, কেমন করে সে সূর্য থেকে বারে বারে সরে যায়, আবার এমন ভাবে নিকটবর্তী হয় যে, সূর্যের সাথে একেবারে মিলে যায়। এ ব্যাপার থেকে প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় প্রকারের গতি বুঝতে পারবে।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "আকাশমণ্ডল এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, মেরুদ্বয়ের উপরে প্রবল বেগে অবিরত ঘুরছে আর নক্ষত্রসমূহ এমন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে যেখানে Batu-hut (মীনোদর)ও নাই আর Shartain (অশ্বিনী) নক্ষত্রদ্বয়ও নাই, অর্থাৎ এই নক্ষত্রদ্বয়ের সীমারেখা যা আসলে মহাবিষুব (vernal equinox)।"

টীকাকার বলভদ্র বলেছেন: "সমগ্র পৃথিবী দুই মেরুতে আটকানো এবং চক্রাকারে চলমান। এক 'কল্পে' সে গতির আরম্ভ, অন্য কল্পে তা সমাপ্ত। তবে নিরবচ্ছিন্ন গতির জন্য পৃথিবীকে অনাদি, অনন্ত বলা উচিত নয়।"

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "৬০ ঘড়িতে (ঘটিকা) বিভক্ত নিরক্ষ (—যে স্থানের অক্ষরেখা নাই—)হচ্ছে মেরুবাসীদের দিগন্ত। সেখানকার পূর্বদিক আসলে পশ্চিম;

এ স্থানের অর্থাৎ নিরক্ষের পিছনে, দক্ষিণের দিকে, 'বাড়বামুখ' ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র। গ্রহনক্ষত্রাদি যখন আবর্তন করতে থাকে, মধ্যরেখা (meridian) তখন উত্তরে অবস্থিত দেবতা আর দক্ষিণে অবস্থিত দৈত্যদের দিগন্তরূপে উভয়ের চোখে সমানভাবে প্রতিভাত হয়, তবে আবর্তনের অভিমুখ তাদের চোখে বিপরীত হয়ে দেখা দেয় ; অর্থাৎ দেবগণ যে গতিকে দক্ষিণমুখী দেখে, দৈত্যরা তাকে বামমুখী দেখে। ঠিক যেমন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বস্তুকে লোকে জলের মধ্যে বাম দিকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে। গতিবেগের এই সমতা, যার কখনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, বায়ুর কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু এ বায়ু আমাদের পরিচিত বাতাস নয়, যার বেগ কখনও মন্দ, কখনও তীব্র, নানাপ্রকারের হয়, কারণ সে বায়ু কখনই মন্থর হয় না।"

আর এক স্থানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন ঃ "সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্রকে বাতাস পশ্চিমের দিকে একই চক্রাকারে আবর্তিত করতে থাকে ; গ্রহগুলি আবার পূর্বদিকে কুমোরের চাকার ঘূর্ণিবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো, মন্থর গতিতে চলতে থাকে। এই ধূলিকণাতে যে গতি পরিলক্ষিত হয়, তা আসলে ঘূর্ণমান চাকারই গতি তার নিজস্ব গতি তেমন ধরা যায় না। এই সিদ্ধান্তের সাথে লাট, আর্যভট্ট ও বশিষ্ঠ একমত। কিন্তু কতক লোক মনে করে যে, পৃথিবী সচল, আর আকাশ স্থির হয়ে রয়েছে। মানুষ যাকে পূর্ব-পশ্চিমের গতি মনে করে, ফেরেস্তারা (দেবতা) তাকেই বাম থেকে দক্ষিণের দিকে আর দৈত্যরা দক্ষিণ থেকে বামের দিকে মনে করে।"

ভারতীয়দের গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি যা পড়েছি, তা এই। বাতাসকে যে ওরা গতির কারণ বলে ইঙ্গিত করেছে, আমার ধারণায় ব্যাপারটিকে সহজ করে বোঝাবার জন্যই তা করেছে। কেননা পক্ষযুক্ত যন্ত্র বা অনুরূপ খেলনা যে বাতাসের বেগে গতিশীল হয়, তা তো চোখেই দেখা যায়। কিন্তু যখনই আদি চালকের (ঈশ্বর) প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তখনই প্রাকৃতিক বাতাসের দৃষ্টান্ত ওরা ত্যাগ করে, কেননা, কারণভেদে বাতাসের বেগের তারতম্য ঘটে। যদিও বাতাস অন্য বস্তুতে গতি সঞ্চার করে, তবুও গতি তার নিজস্ব গুণ নয় ; অন্য বস্তুকে স্পর্শ না করলে তার গতিশক্তি আসে না, কারণ বাতাস নিজেই একটি দেহ, যার উপরে তার বাইরের শক্তি ক্রিয়া করে এবং এই ক্রিয়ানুযায়ী তার গতিবেগের তারতম্য হয়।

বাতাস কখনও নিশ্চল থাকে না বলে যে ওরা উক্তি করেছে, তার উদ্দেশ্য, চালনার নিত্যতার দিকে ইঙ্গিত করা, শুধু গতি ও নিশ্চলতা বোঝানো নয়, যা জড়দেহে স্বভাবতঃই ঘটে। তেমনই, গতিবেগ মন্থর না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সব

রকমের আকস্মিকতা থেকে সে মুক্ত, কেননা গতিমান্দ্য বা গতিক্ষয় বিপরীত গুণসম্পন্ন পদার্থসৃষ্ট বস্তুতেই হতে পারে।

মেরুদ্বয় স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধারণ করে আছে, এ কথার দ্বারা শৃঙ্খলাবিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ; তার অর্থ এ নয় যে মেরুদ্বয় না থাকলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নীচে পড়ে যেত। প্রাচীন ইউনানের একটি লোক সম্বন্ধে কথিত আছে যে, সে মনে করত, ছায়াপথ কোন এক কালে সূর্যের গতিপথ ছিল. পরে সূর্য সে পথ ত্যাগ করে। এ ব্যাপারের অর্থ এই যে, গতিসমূহ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। মেরুদ্বয়-সংক্রান্ত ওদের উক্তিরও কতকটা এই অর্থ হতে পারে, অর্থাৎ মেরুদ্বয় গতির স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করে।

গতি সমাপ্তির যে কথা বলভদ্র বলেছেন, তার অর্থ এই যে, গণনার দ্বারা যা কিছু সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত, দুইটি কারণে তার শেষ হবেই হবে ; প্রথম, তার আরম্ভ আছে, যেহেতু সংখ্যামাত্রই এক ও একের বহুলীকরণেই সংখ্যা গঠিত হয়, অথচ মূলে এক স্বাধীনভাবেই বর্তমান আছে। দ্বিতীয়, তার কিছু অংশ সময়ের বর্তমান মুহূর্তে আছে, কেননা শুধু অস্তিত্বকালে দৈর্ঘ্যের দরুন যদি দিবারাত্রির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহলে সে দিবারাত্রির একটা আরম্ভ থাকতেই হবে। কেউ যদি তর্ক তুলে বলে যে, সূর্যমণ্ডলে (sphere) দিবারাত্রি নাই, দিবারাত্রির অস্তিত্ব আপেক্ষিক, কেবল পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কেই তার অস্তিত্ব থাকে এবং কল্পনায় পৃথিবীকে জগৎ থেকে সরিয়ে নিলে রাত্রিদিনের অস্তিত্বও থাকবে না এবং দিবস গণনা করে কাল নির্ণয় করার উপায়ও থাকবে না, তাহলে তার উত্তর মতে বলভদ্রকে (মৌলিক) প্রথম গতি ছেড়ে দ্বিতীয় (প্রকারের) গতির কারণ দেখাতে হবে। এই দ্বিতীয় গতি হচ্ছে গ্রহের আবর্তন চক্র (cycle) যার সম্বন্ধ সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে নয়। বলভদ্র এ আবর্তনকালকে 'কল্প' নাম দিয়েছেন, কারণ সব কিছুই সে আবর্তনের অন্তর্গত এবং তার সাথেই সব কিছুর আরম্ভ।

মধ্যরেখা ৬০ ভাগে বিভক্ত বলে ব্রহ্মগুপ্ত যে উক্তি করেছেন, তা "মধ্যরেখা ২৪ ভাগে বিভক্ত" আমাদের মধ্যে কারো কারো এমন উক্তি করারই সমান। কারণ, মধ্যরেখাই সময় নির্ণয়ের ও গণনার পরিমাপক (ظلّ), তার পরিক্রমা (revolution) ২৪ ঘণ্টা বা হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী ৬০ ঘড়িতে (ঘটিকা) সম্পূর্ণ হয়। এই কারণেই ওরা রাশিচিহ্নের উদয়কে মধ্যরেখার সময় (৩৬০ ডিগ্রী) দিয়ে না হিসাব করে 'ঘড়ি' (ঘটিকা) দিয়ে পরিমাপ করে।

বাতাস গ্রহ-নক্ষত্রকে আবর্তিত করে, একথা বলার পরই ব্রহ্মগুপ্ত কেবলমাত্র গ্রহগুলি সম্বন্ধে বললেন যে, তাদের পূর্বাভিমুখী একটি মন্থর গতি আছে। এগুলিকে এইভাবে বিশেষিত করার অর্থ যে, তাঁর মতে স্থির নক্ষত্রগুলির এরূপ কোন গতি নাই। তা নইলে, তিনি নিশ্চয়ই বলতেন যে গ্রহগুলির মতো এদেরও এইরূপ গতি আছে এবং আয়তন ও এই বিপরীতমুখী গতিবেগের প্রভেদ ছাড়া আর কোন পার্থক্য তাদের মধ্যে নাই। কেউ কেউ বলে থাকে যে, পুরাকালে লোকেরা স্থির নক্ষত্রসমূহের গতি বুঝত না, অনেক কাল পরে তারা বুঝতে পেরেছে। ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে বিভিন্ন আবর্তনের বর্ণনা স্থির নক্ষত্রগুলির আবর্তনের অনুল্লেখ থেকে উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়, বিশেষ করে যখন তিনি এই নক্ষত্রসমূহের প্রকাশ-অপ্রকাশকে সূর্যের গতি-পথের বিশেষ বিশেষ ডিগ্রীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

বিষুবরেখার অধিবাসীদের চোখে প্রথম (মৌলিক) গতি দক্ষিণ-বামের গতি নয়, ব্রহ্মগুপ্তের এ উক্তি বুঝতে হলে পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, উত্তর দক্ষিণ মেরুর নীচে যে বাস করে, যে দিকেই সে মুখ ফেরাক না কেন, চলমান জ্যোতিষ্ককে সর্বদাই সম্মুখে দেখতে পাবে। যেহেতু তাদের গতি একদিকে, সেহেতু প্রথমে তারা দর্শকের এক হাতের সম্মুখে থাকবে এবং পরে অন্য হাতের সম্মুখে থাকবে। দুই মেরুবাসীদের চোখে এই ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত দেখাবে, জল বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্তির মতো, যা অন্য আর এক ব্যক্তির ন্যায় দর্শকের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখাবে; দর্শকের ডানদিক প্রতিবিম্বের বাম দিকে থাকে আর বাম দিকে তার ডান দিক থাকে। এই রকম, উত্তরের অক্ষাংশে যারা বাস করে, তাদের সম্মুখে ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডল দক্ষিণের দিকে থাকবে, আর যারা দক্ষিণ অক্ষাংশে থাকে, তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে তাদের সম্মুখে উত্তরের দিকে দেখবে। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখে জ্যোতিষ্কের আবর্তনগতি যেমন দেখাবে, মেরু ও বাড়বামুখের অধিবাসীরাও সেইরকম দেখবে। কিন্তু বিষুবরেখার অধিবাসীদের প্রায় মাথার উপরে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ঘুরবে, সেজন্য কোন দিক থেকেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাদের সম্মুখে পড়বে না। তবে, আসল জ্যোতিষ্কের গতিপথ বিষুবরেখা থেকে কিঞ্চিত দূরেই থাকে, সেজন্য সেখানকার অধিবাসীরা এই গতিকে দুই দিক থেকে তাদের সম্মুখে দেখে: উত্তরের জ্যোতিষ্ককে দক্ষিণ থেকে বামে, আর দক্ষিণের জ্যোতিষ্ককে বাম থেকে দক্ষিণে যেতে দেখে। তারা যেন দুই মেরুর অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যই নিজেদের মধ্যে একত্রিত দেখতে

পায় এবং জ্যোতিষ্কের গতি তারা বাম থেকে দক্ষিণে না দক্ষিণ থেকে বামদিকে দেখবে, তা একান্তভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যে নিরক্ষকে ব্রহ্মগুপ্ত ঘটিকায় বিভক্ত বলেছেন, সে হচ্ছে বিষুবরেখায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির 'খ-মধ্য' অথবা সুবিন্দুরেখা।

পুরাণকারদের উক্তি অনুযায়ী, আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর উপরে একটি নিশ্চল গম্বুজ এবং নক্ষত্রসমূহ পৃথক পৃথকভাবে পূব থেকে পশ্চিমে চলমান। দ্বিতীয় প্রকারের গতির খবর ওরা আর কেমন করে পাবে? আর পেলেও জ্যোতির্বিদ্যার বিপক্ষীয়রা একই বস্তুর আলাদাভাবে দুই বিভিন্নদিকে গতিশীল হওয়া কি করে স্বীকার করে?

এখন এ বিষয়ে পুরাণের উক্তি যা আমি পেয়েছি তা উদ্ধৃত করব, যদিও তাতে কারুর বিশেষ কোন লাভ নাই।

'মৎস্যপুরাণে' বলা হয়েছে : "সূর্য ও চন্দ্র দক্ষিণ দিক দিয়ে তীরবেগে মেরুর চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্য একটি ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, যার প্রান্তভাগ ঘূর্ণিবেগে প্রজ্জ্বলিত। প্রকৃতপক্ষে সূর্য কখনই অদৃশ্য হয় না; মেরুর চারিকোণে অবস্থিত নগর চতুষ্টয়ের কেবলমাত্র একটি নগরের অধিবাসীদের দৃষ্টি থেকে সে অদৃশ্য হয়ে থাকে, অন্যগুলি থেকে অদৃশ্য হয় না। 'লোকালোক' পর্বতের উত্তর দিক থেকে আরম্ভ করে সূর্য মেরুর চতুর্দিকে ঘোরে, 'লোকালোক'কে সে অতিক্রম করে না, আর তার দক্ষিণ পার্শ্বকে সে আলোকিতও করে না। রাত্রে সে অদৃশ্য হয় কেবল দূরত্বের জন্য। সহস্র যোজন থেকেও মানুষ তাকে দেখতে পায় বটে, কিন্তু চোখের অতি নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুও তাকে আড়াল করে দিতে পারে। সূর্য যখন 'পুষ্কর' দ্বীপের সুবিন্দুতে থাকে, তখন একঘণ্টার ৩/৫ সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীর ৩/৩০ ভাগ অতিক্রম করে যায়; অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে সূর্য ২১ লক্ষ ৫০ হাজার যোজন পার হয়ে যায়। তারপরে সূর্য উত্তর দিকে ঘোরে এবং উপরোক্ত দূরত্বের তিনগুন দূরত্ব অতিক্রম করে। তার ফলে দিবাভাগ দীর্ঘ হয়। দক্ষিণাপথের ১ দিবসে সূর্য ৯ কোটি ১০ হাজার ৪৫ যোজন অতিক্রম করে। তারপরে আবার যখন উত্তরে প্রত্যাবর্তন করে, 'ক্ষীর' অর্থাৎ ছায়াপথকে প্রদক্ষিণ করে, তখন সে দৈনিক ৩ কোটি ২১ লক্ষ যোজন পরিক্রমণ করে।"

এখন এই বর্ণনার অসঙ্গতি একবার বিবেচনা করুন। নক্ষত্রের তীরবেগে আবর্তন অবশ্য অতিশয়োক্তি, জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এই গতিবেগ শুধু দক্ষিণেই হয়, উত্তরে হয় না, তা তো হতে পারে না।

যেহেতু উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিকেই সূর্যের পরিক্রমার সীমা আছে যেখান থেকে সে প্রত্যাবর্তন করে, এবং যেহেতু দক্ষিণ সীমা থেকে উত্তরাপথেও তার গতি তীরবেগে হতে বাধ্য। এখানে কিন্তু উত্তর মেরু সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, যার মতে উত্তর মেরুর অবস্থান উপরে, আর দক্ষিণ মেরুর নীচে, সেজন্য ঢালু তক্তায় (see-saw) ক্রীড়ারত শিশুদের মতো, নক্ষত্রগুলি দক্ষিণের দিকে গড়িয়ে পড়ে। যদি তীরবেগ শব্দ দ্বিতীয় 'গতি' অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে—যদিও এটি আসলে প্রথম গতি—তাহলেও বলতে হয় যে, দ্বিতীয় গতিতে নক্ষত্রাদি মেরুর চতুর্দিকে পরিক্রম করে না এবং এই দ্বিতীয় গতির পথ মাত্র ২৪ বৃত্তাংশ পরিমাণ মেরু-দিগন্তের দিকে নত হয়ে আছে। প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে সূর্যের গতির উপমা কতদূর কষ্টকল্পিত তাও একবার বিবেচনা করুন। আমরা যদি মনে করতাম যে সূর্য একটি সম্পূর্ণ বলয়ের আকারে চলমান, তাহলেও না হয় সে ধারণাকে দূর করার জন্য কাষ্ঠখণ্ডের উপমা দেওয়ার মানে হোত। কিন্তু আমরা তো তা মনে করি না; বরঞ্চ আমরা সূর্যকে চলমান বস্তুখণ্ড হিসাবে দেখি: এ উপমার তাহলে কি প্রয়োজন? আর আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, সূর্যের গতি একটি বৃত্ত রচনা করে, তাহলেও প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের দৃষ্টান্ত অর্থহীন, কারণ একটি সূতায় পাথর বেঁধে মাথার উপর ঘোরালেও ঐরূপ বৃত্ত রচিত হবে।

কোন লোকালয়ে সূর্য উদয় হলে যে অন্য লোকালয়ে তা অদৃশ্য থাকে, একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাসের কথা উপরে বলেছি তার প্রভাব এখানেও বিদ্যমান। 'লোকালোক' পর্বতের উল্লেখই তার প্রমাণ, যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তার উত্তর অথবা জনপদের দিক সূর্যালোকিত, আর দক্ষিণ দিক অন্ধকার।

আর রাত্রিতে সূর্য অদৃশ্য থাকার হেতু দূরত্ব নয়। তার কারণ, অন্য বস্তু তাকে আড়াল করে রাখে; আমাদের মতে সে বস্তু হচ্ছে পৃথিবী; আর 'মৎস্যপুরাণ'কারের মতে, মেরু পর্বত। তবে গ্রন্থকারের ধারণা যে, সূর্যের প্রদক্ষিণ পথ মেরুর চতুর্দিকে, আর আমরা (মানুষ) মেরুর একপার্শ্বে বাস করি, তার দরুন সূর্যের পথ থেকে আমাদের দূরত্ব অসমান। গ্রন্থকারের আসল ধারণা যে এইরূপ, তা তার পরবর্তী মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। রাত্রে সূর্য অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে তার দূরত্বের কোনই সম্পর্ক নাই।

'মৎস্যপুরাণে' দূরত্ব নিরূপক যেসব সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সবই অশুদ্ধ বলে আমি মনে করি, কারণ সেগুলি গণনাসিদ্ধ নয়। গ্রন্থকার সূর্যের

উত্তরাপথকে দক্ষিণাপথের তিনগুণ বলে ধরেছেন এবং এই ব্যাপারকেই দিবসের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হওয়ার কারণ বলে মনে করেছেন। অথচ, মোট দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য প্রকৃতপক্ষে সব সময়ে একই থাকে এবং সব সময়েই উত্তরাপথের রাত্রি দক্ষিণাপথের দিবস ও দক্ষিণাপথের রাত্রি উত্তরাপথের দিবসের সমান থাকে। গ্রন্থকারের উক্তি সত্য হতে হলে আমাদেরকে এমন এক অক্ষরেখার (latitude) কথা ভাবতে হবে যেখানে গ্রীষ্মকালে দিবস হবে ৪৫ ঘটিকার আর শীতকালের দিবস হবে ১৫ ঘটিকার।

উত্তরাপথে সূর্যের গতি দ্রুততর হয় বলে গ্রন্থকার যে উক্তি করেছেন, তাও প্রমাণসাপেক্ষ। মেরু যত নিকটবর্তী হয়, ভূমণ্ডলের উত্তরার্ধের মধ্যরেখাগুলির (meridian) পারস্পরিক দূরত্ব তত কমে আসে এবং দক্ষিণে বিষুবরেখার যত নিকটবর্তী হয়, তার দূরত্ব তত বাড়ে। সূর্য যদি অল্প দূরত্ব দ্রুতগতিতে পার হয়, অধিক দূরত্ব পার হতে যে সময় লাগবে, তাতে নিশ্চয় তার চেয়ে কম সময়ই লাগবে। বিশেষ করে, অধিক দূরত্ব পার হতে যদি তার গতি মন্থর হতে থাকে। ব্যাপারটি কিন্তু আসলে এর ঠিক বিপরীত।

পুষ্কর দ্বীপের উপরে সূর্য আবর্তন করে, 'মৎস্যপুরাণের' এই উক্তি দ্বারা মকরক্রান্তির (winter solstice) ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, সূর্য এই রেখায় এলে, দিবস, কর্কট বা অন্য যে কোন ক্রান্তির দিবসের চেয়ে দীর্ঘতর হবে। এ উক্তির কোন অর্থই বোঝা যায় না।

'বায়ুপুরাণে'ও এই রকম কথা আছে যে, দক্ষিণায়নে দিবস ১২ মুহূর্ত দীর্ঘ হয়, উত্তরায়ণে হয় ১৮ মুহূর্ত এবং সূর্যের প্রদক্ষিণ পথ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ১৮৩ দিনে ১৭২২১ যোজন, অর্থাৎ প্রতিদিনে ৯৪ যোজন নত হয়।

এক মুহূর্ত ঘণ্টার $\frac{৪}{৫}$ ভাগ। যে অক্ষরেখার দিবস ১৪$\frac{২}{৫}$ ঘণ্টা দীর্ঘ, সেখানেই বায়ুপুরাণের এ বর্ণনা প্রযুক্ত হতে পারে। যোজন সংখ্যা যা দেওয়া হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে তা গগনমণ্ডলের (فلك) দুই পার্শ্বের বিষুবলম্বের (declination) এক অংশমাত্র। তাঁর মতে বিষুবলম্বের ২৪ ভাগ আছে। অতএব সমস্ত গগনমণ্ডলের যোজনসংখ্যা হয় ১২৯১৫৭$\frac{১}{২}$ এবং দুই পার্শ্বের বিষুবলম্ব (double inclination) অতিক্রম করতে সূর্যের যতদিন লাগে, তা (ভগ্নাংশ, অর্থাৎ $\frac{৫}{৮}$ দিন না ধরলে) সৌরবৎসরের অর্ধেক।

'বায়ুপুরাণে' আরও বলা হয়েছে যে, "উত্তরাপথে সূর্যের গতি দিবসে মন্থর আর রাত্রে ক্ষিপ্র হয়, আর দক্ষিণাপথে ঠিক তার বিপরীত। সেজন্য উত্তরে

দিবাভাগ দীর্ঘতর হয় প্রায় ১৮ মুহূর্তের মতো।" এসব এমন লোকের কথা সূর্যের পূর্বাভিমুখী গতির জ্ঞান যার মোটেই নাই এবং যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা দিবসের চাপ (arc) পরিমাপ করতে জানে না।

বিষ্ণুধর্মে আছে, "মেরুর নীচে সপ্তর্ষির কক্ষপথ, তার নীচে শনির, তার নীচে বৃহস্পতির, তার নীচে মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের কক্ষপথ। এরা সব পূর্বদিকে জাঁতার মতো, প্রত্যেকটি গ্রহের নিজস্ব গতিতে অবিরাম ঘুরতে থাকে, কারও গতি ক্ষিপ্র, কারো বা মন্থর। অনন্তকাল ধরে তাদের উপরে জীবন ও মৃত্যুর সহস্রবার পুনরাবর্তন ঘটেছে।"

এই উক্তির বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য যাচাই করতে গেলে দেখা যাবে, এতে অসঙ্গতি আছে। মেরুকে উচ্চতম এবং সপ্তর্ষিকে তার নীচে অবস্থিত ধরে নিলেও সপ্তর্ষি মেরুবাসীদের খ-বিন্দুর (zenith) নীচেই থাকবে। গ্রন্থকারের এ উক্তি অবশ্য সত্য, কিন্তু গ্রহ সম্বন্ধে তার উক্তি সত্য নয়, কারণ তিনি 'নীচে' শব্দ দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন, তা আসলে পৃথিবী থেকে নৈকট্য ও দূরত্বজ্ঞাপক। সে অর্থে তাঁর উক্তি সত্য নয়, যদি না ধরে নেওয়া হয় যে, শনিগ্রহের বিষুবলম্ব (declination) সর্বাপেক্ষা অধিক, তারপরে বৃহস্পতির এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে বাকী গ্রহগুলির; এবং সেই সঙ্গে একথাও ধরে নিতে হয় যে গ্রহগুলির এই এই বিষুবলম্ব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়।

বিষ্ণুধর্মের সম্পূর্ণ বক্তব্য বিচার করলে দেখা যাবে যে, গ্রহের উপরে স্থির নক্ষত্রসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সত্য, কিন্তু মেরু নক্ষত্রের উপরে আছে, একথা বলা তাঁর ভুল হয়েছে, কারণ আসলে মেরুর অবস্থান নক্ষত্রের নীচে। তাছাড়া গ্রহসমূহের জাঁতার মতন আবর্তন পশ্চিমাভিমুখী 'প্রথম' গতির বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থকারের উক্ত দ্বিতীয় গতির নয়। তাঁর মতে, গ্রহসমূহ হচ্ছে পুণ্যবলে উন্নীত জীবাত্মা, মানবজন্মের শেষে যারা উর্দ্ধলোকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সহস্র সংখ্যা ব্যবহার করেছেন, আমার মনে হয় তার কারণ এই হতে পারে যে, গ্রন্থকার তাদের কর্মশক্তিহীন অস্তিত্বের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, কিম্বা তাদের কারুর মোক্ষলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে, কারুর এখনো হয়নি; সেজন্য তাদের সংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং যারই হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তার সীমা নির্দিষ্ট থাকে।